প্রীতির বন্ধন

যুথিকা বড়ুয়া

রক্তের সম্পর্ক সবচে' বড় সম্পর্ক। আপনজন যত দূরেই থাকুক, সম্পর্ক চিরকাল অটুট থাকে! কখনো ছিন্ন হয়না! আবার অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায়, দীর্ঘদিন বিচ্ছিন্নভাবে থাকার কারণে সম্পর্কের গভীরতা ক্রমশ কমে আসে! আগের মতো টান আর থাকেনা! তদ্রুপ অনাত্মিয়া, অজানা অপরিচিত মানুষের সাথে অগাধ মেলামেশায় এবং উদয়াস্থ মুখদর্শণে সামাজিক ভ্রাতৃত্ববোধ ও প্রীতির সম্পর্ক গড়ে ওঠাও স্বাভাবিক! যার সূত্র ধরে অচীরেই জন্ম নেয়, ভক্তি-শ্রদ্ধা, স্নেহ-মমতা আর ভালোবাসা। যে ভালোবাসায় কোনো স্বার্থ নেই! কোনো চাহিদা নেই! নেই কোনো ঈর্ষা, ক্রোধ, মান-অভিমান, অনুযোগ ও অভিযোগ। যার সঙ্গে রক্তের কোনো সম্পর্ক নেই!

যেমন আমাদের প্রতিবেশী পারুলের সঙ্গে মাত্র দু'দিনের আলাপচারিতায় গড়ে ওঠে বন্ধুত্ব! পারুল খুবই মিশুকে এবং মিষ্টি স্বভাবের মেয়ে! কথায় কথায় হাসে! প্রথম দর্শণেই আবেগাপ্লুত হয়ে সহৃদয়ে এমন অমায়িকভাবে আমায় 'দিদি' বলে সম্বোধন করল, ও' যেন আমার কতদিনের চেনা, কত আপনজন! বহু দিনের সম্পর্ক ওর সঙ্গে। প্রবাস জীবনে শত ব্যস্ততা আর প্রতিকূলতার মধ্যেও অবসর সময়ে আমাদের কথা হতো টেলিফোনের মাধ্যমে। গল্প করতো মিডলইষ্টের। শুনতাম, জানা দেশের অজানা কথা! কিন্তু দিদি বলে ডাকলেই আবেগাপ্লুত হয়ে মুহূর্ত্যেই কোমল হৃদয়টা আমার গহীন মমতায় ভরে গিয়ে মনশ্চক্ষে ভেসে উঠতো, পুতুলের মতো আমার ছোট্টবোন মিনুর গোলাপ গালের তুলতুলে নরম মসৃণ দুষ্টুমিষ্টি সেই মুখখানা! হারিয়ে যেতাম কৈশোরের হাজার মায়া জড়ানো সোনাঝরা দিনের অম্লান স্মৃতির মণিমেলায়। যখন উন্মুক্ত নীল সামিয়ানার নীচে মখ্‌মলে স্নিগ্ধ সবুজ ঘাসের প'রে কিংবা প্রস্ফূটিত লাল-নীল-হলদে-বেগুনী ফুলের বিকশিত পাঁপড়িগুলিতে ঝাঁকে ঝাঁকে উড়ে এসে বসা রং-বেররংএর ফড়িং, প্রজাপতি দেখলেই মিনু উর্দ্ধঃশ্বাসে ছুটে যেতো ওদের দুহাতে জড়িয়ে ধরতে! ততক্ষণে বুদ্ধিরচাতুর্য্যে ওরা চোখের পলকে ওকে ফাঁকি দিয়ে ফুরুত করে উড়ে পালাতো। মিনুও মরিয়া হয়ে ছুটতো ওদের পিছু পিছু। আর ধরতে না পারার চরম ব্যর্থতায় ঠোঁটদুটো ফুলিয়ে, হাতের আঙ্গুলগুলি কাঁমড়ে ধরে, পা-দু'টো ব্যাঁকা করে, অশ্রুসিক্ত চোখে এমন করুণ দৃষ্টিতে চেয়ে থাকতো, বুকটা মোচড় দিয়ে উঠলেও হাসি চেপে রাখা যেতোনা। মিনু ভ্যাঁ করে কেঁদে উঠতো অপমানে! তখন ওকে শান্ত করতে গিয়ে বুকের গভীরে জড়িয়ে ধরে ওর কপালে, গালে চুম্বনে চুম্বনে অবুঝ মনটা ওর মুহূর্ত্যেই অনাবিল খুশীতে ভরিয়ে দিতাম। আর তক্ষুণিই ওর আঁধার মলিন মুখে হাসির ঝিলিক দিতে দিতে খিল্‌খিল শব্দে বয়ে যেতো হাসির ঝর্ণা।

হঠাৎ একদিন পারুল সপরিবারে দেশান্তর হচ্ছে শুনে মেঘের আড়ালে সূর্য ডুবে যাবার মতো উৎফুল্ল মনটা আমার তৎক্ষণাৎ বিষাদে ভরে গেল। ঘনিয়ে এলো বিদায়ের পালা। কিন্তু বিদায় মানেই তো বিচ্ছেদ! আর বিচ্ছেদ মানেই বেদনা! যা আমার কোমল হৃদয়কে বড্ড বেশী কষ্ট দেয়। কিন্তু কেন? পারুল তো আমার কেউ হয় না! বছর তিনেক আগেও তো ওকে চিনতাম না, জাতাম না। তা'হলে!

হয়তো অদৃশ্য এক দৃঢ় বন্ধনে জড়িয়ে পড়েছিলাম বলেই! ওকে ভালোবেসে ফেলেছিলাম বলেই! তাই সেদিন সারারাত চোখের পাতাদু'টোকে এক করতে পারিনি। ভিতরে ভিতরে ক্ষণপূর্বের বেদনাময় গহীন অনুভূতিগুলি বারবার দংষণে অন্তরের কষ্ট-বেদনাগুলিই তরল হয়ে অঝোরে নয়নে শুধু বয়ে যাচ্ছিল। আর তখনিই মনে পড়ে গেল, ঠিক এমনি করেই

অদৃশ্য মায়াজ্বালে জড়িয়ে, অশ্রুজলে প্লাবিত করে চিরদিনের মতো বিদায় নিয়ে চলে গিয়ে ছিল আমাদের বুলবুল।

বুলবুল ছোট্ট একটি পাখী। একদিন কোথা থেকে উড়ে এসে আমাদের রান্নাঘরের চাল ঘেঁষা বিশাল পেঁপে গাছের ডালে বসে থর্‌থর্‌ করে কাঁপছিল। রক্তে ভিজে যাচ্ছিল ওর গা। কিসে যেন কাঁমড়িয়ে ঘা করে দিয়েছিল। তাড়ালেও যাচ্ছিল না! অবশেষে মিনুর একান্ত পীড়াপীড়িতেই পাখীটাকে আশ্রয় দেওয়া হলো গৃহের এককোণায় এবং যথাযথ সেবা-শুশ্রূষায় প্রস্ফূটিত ফুলের মতো দুদিনেই চাঙ্গা হয়ে উঠলো। তখন কি আর ছেড়ে দেওয়া যায়! বুলবুল নামকরণেই রয়ে গেল আমাদের পোষা হয়ে। থাকতো খাঁচার ভিতরে। আর উতলা হয়ে মিনু সারাদিন বসে থাকতো খাঁচা ধরে! বুলবুলকে কখনো একা থাকতে দিতো না! অথচ নিজে অবোধশিশু, আর বুলবুল অবলা প্রাণী। সারাক্ষণ আবোল-তাবোল বকতো ওর সঙ্গে। বুলবুলের মা-বাবা কোথায়! হারিয়ে গ্যাছে কি না! ওর মন খারাপ লাগছে কি না! ওর ঠোঁটটা এতো লম্বা কেন! ওর দাঁত নেই কেন! হাজারটা প্রশ্ন মিনুর। বুলবুলও যেন কত বুঝতো ওর কথা! ক্ষণে ক্ষণে পাখনা মেলে নেচে উঠতো আর কানে তালা লাগিয়ে কর্কশ কণ্ঠে ওর ভাষায় গেয়ে উঠতো, 'টিরিট্টি, টিরিট্টি!'

একদিন খাঁচাটা বারান্দার কার্ণিশে ঝুলিয়ে রাখতে গিয়ে মাটিতে পড়ে খাঁচার দরজাটাই বেঁকে যায়! শক্ত তার দিয়ে বেঁধে দেওয়া সত্ত্বেও দরজাটা কিছুতেই আর বন্ধ হতো না! আলগাই থাকতো। ভয় হতো, বুলবুল উড়ে না পালিয়ে যায়! কিন্তু তার পরেও প্রায় ন'মাস প্রভুভক্তের মতোই পোষা হয়েছিল! ভাবলাম, আমাদের মতোই বুলবুলও বোধহয় মায়ার বন্ধনে জড়িয়ে পড়েছে! ওদের অন্তরেও মায়া-মমতা-ভালোবাসা আছে! কিন্তু ওযে একটা পশু! মানুষের ভালোবাসা ওরা কখনোই বুঝবে না! যার মূল্য ওরা কোনদিনই দিতে পারবে না! আর সেটাই দৃষ্টান্তসরূপ প্রমাণিত করে, একদিন দিগন্তের প্রান্তরে উষার প্রথম সূর্য্যের উজ্জ্বল আলো উদ্ভাসিত হবার পূর্বেই বুলবুল কখন যে খাঁচা থেকে বেরিয়ে উড়ে পালিয়ে গেল, আমরা কেউ জানতে পারলাম না! ভেবেছিলাম, মুক্ত গগনের বিশুদ্ধ বাতাস কিছুক্ষণ উপভোগ করেই ফিরে আসবে নিশ্চয়ই, কিন্তু বুলবুল আর ফিরে আসেনি!

কেঁদে কেঁদে হয়রান মিনু। আমরাও বেদনাহত! কিন্তু কতদিন! দিন যায়, মাস যায়, কেটে যায় বছর। ততদিনে শৈশবের ধূলোবালি ঝেড়ে মিনু কৈশোরে, আমি যৌবনে পৌঁছেই হৃদয়পটভূমি থেকে ক্রমশ একটু একটু করে মুছে যেতে লাগল বুলবুলের স্মৃতি। বিলুপ্ত হয়ে গেল, মনের গভীরে জমে থাকা রাশি রাশি মায়া-মমতা আর ভালোবাসা।

হয়তো এমনি করেই একদিন পারুলও আমাদের ভুলে যাবে। ভুলে যাবে ঋতুর মতো পরিবর্তিত জীবন যাত্রার অন্তবিহীন পথ চলতে চলতে পিছনে ফেলে আসা মানবপ্রীতির আনন্দময় কিছু স্মৃতি ও ভালোবাসা। যা প্রাত্যাহিক জীবনে আমার স্মৃতির পথে অম্লান পাথেয় হয়ে থাকবে।

যুথিকা বড়ুয়া : কানাডা প্রবাসী লেখক ও বিশিষ্ঠ কণ্ঠশিল্পী। guddi_2003@hotmail.com